ক্ষমতার ক্ষুধা

পাকিস্তান বিভাজন ও শেখ মুজিব

উস্তাদ আবু হুদ বাঙ্গালী হাফিযাহুল্লাহ

ß 1 c {n ß£ {

পাকিস্তান বিভাজন ও শেখ মুজিব

উস্তাদ আবু হুদ বাঙ্গালী হাফিযাহুল্লাহ

AL HIKMAH MEDIA

প্রকাশনা

ভূমিকা

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ আবু হুদ বাঙ্গালী হাফিযাহুল্লাহ'র 'ক্ষমতার ক্ষুধা: পাকিস্তান বিভাজন ও শেখ মুজিব' নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় লেখক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) আলাদা হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। সেইসাথে মুজিব ও আওয়ামী লীগের সাথে ভারতের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের কারণ সংক্ষেপে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধ থেকে পাঠক ও পাঠিকাগণ ক্ষমতাসীন হাসিনা সরকার কেন নিজেদের উজাড় করে দিয়ে ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ – সেবিষয়টি বুঝতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে 'জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা'র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' এর গত নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০২১ ইংরেজি সংখ্যায় সংখ্যায় "একতেদার কা লালচ: তাকসিমে পাকিস্তান আউর শেখ মুজিব" (اقتدار کا لالچ: تقسیم پاکستان اور شیخ مجیب) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির মূল বাংলা সংস্করণটি লেখক আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যা এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। আলহামদু লিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাইদের ও বোনদের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন।

আবু যুবাইদা
২৮শে জুমাদাল উলা, ১৪৪৩ হিজরি
২রা জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি

(১)

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও বাংলা বিভক্ত হয়ে, এক অংশ যায় পাকিস্তানে আর অপর অংশ যায় ভারতে। অসংখ্য মুসলিমের জীবন দিতে হয় ভারতীয় অংশ থেকে পাকিস্তানী অংশে স্থানান্তরিত হতে গিয়ে।

অথচ, মাত্র ২৪ বছরের মাথায় দুইশ বছরের ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত এই রাষ্ট্র অখণ্ডতা হারায়। ভারতীয় হিন্দুদের অনাচার জুলুম থেকে বাঁচতে এগারশ মাইল দূরের রাজধানীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া পূর্ব পাকিস্তান ভারতের অঘোষিত করদরাজ্যে কেন, কীভাবে রূপান্তরিত হলো তা নিয়ে হয়েছে বহু বিশ্লেষণ, বহু আলোচনা। পর্দার সামনের, পেছনের বহু চরিত্র নিয়ে রয়েছে আলোচনা-সমালোচনা।

প্রসঙ্গত, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা তার তাগুত পিতা শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করলো এবং এর মূল আকর্ষণ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কসাই মোদীকে আমন্ত্রণ জানালো। শেখ মুজিবের জন্মদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির গুরুত্ব কেন এত বেশী - এ প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিশেষত শেখ মুজিবের ভারতপ্রেম একটি ঐতিহাসিক বিষয়, যার প্রথম ফলাফল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভাজন। এই ইতিহাস গভীরভাবে না জানলে, এঅঞ্চলে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করাটা কঠিন!

এ লেখায় আমরা পাকিস্তান বিভাজনের পেছনে ভারতীয় ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকার সামান্য আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কাছে দেবতাস্বরূপ নেতা শেখ মুজিবের মরণপণ অপতৎপরতার উপর আলোকপাতের চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

(২)

একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এর শাসকগোষ্ঠী মার্কিন প্রশাসনের দালালী করে ক্ষমতায় টিকে থাকার নগ্ন খেলায় মেতে উঠেছিল। ক্ষমতালোভী এই শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর জেনারেলরা নিজেদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে কুফুরী সংবিধানের উপর ভর করে, পাকিস্তানের সর্বত্র জুলুমের রাজত্ব কায়েম করেছিল। পশ্চিমা প্রভুদের সন্তুষ্টকরণে যত প্রকারের পলিসি বাস্তবায়ন সম্ভব তার সবই বাস্তবায়ন করেছিল। যার পুরস্কারস্বরূপ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে এবং SEATO এর অন্তর্ভুক্ত করে।

একথা তো বাস্তব যে, মানুষের উপর বৈষম্য, শোষণ ও জুলুম করে কখনোই প্রভাব টিকিয়ে রাখা যায় না। বিশেষ করে এগারশ মাইলের দূরের কোন রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করা তো আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

উপরন্তু যেখানে শুধুমাত্র ইসলামের জন্য মানুষ জমায়েত হলো, সেখানে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আমেরিকানদের আনুগত্যের পাশাপাশি অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী দেশ চীনকে খুশি রাখতে, মুসলমানদের জমিনের সর্বত্র নিকৃষ্ট মতবাদ 'কমিউনিজম' এর প্রসারেও ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানের পূর্বাংশে (বর্তমান বাংলাদেশ) কমিউনিস্টদের দৌরাত্ম্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। যা পূর্ব পাকিস্তানে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাটি স্থাপনে ভূমিকা রাখে।

আর কাছাকাছি সময়ে চীনের সাথে যুদ্ধে পর্যদুস্ত ভারত ধাক্কা সামলাতে পরাশক্তির তাবেদারি না করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে, সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে কৌশলগত মিত্রতা স্থাপন করে।

বিশেষত ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধে পরাজয়ের পর শত্রু মার্কিনপন্থী পাকিস্তানের মোকাবেলায় শক্তি অর্জনের স্বার্থে ভারত এ অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়। ১৯৬৫-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে ধরা হয় ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের সোনালী যুগ।

জন্মশত্রু পাকিস্তান ও বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করার হীন চক্রান্ত ভারতীয় সরকারের তখন থেকেই ছিল, তার প্রমাণ মেলে '৬৫ এর যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের কোন প্রকার হামলা না করা!

১৯৭১ এর মার্চে উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী, শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় সরকারের মৌলিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে থাকলেও, নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের মাধ্যম ছিল কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানকারী সাত কোটি বাঙালি মুসলিমের ছোট্ট জনপদটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

পাকিস্তানি প্রশাসনের বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল হিসেবে, বিশেষত জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পলিসিসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের হস্তক্ষেপে শেখ মুজিব ও আওয়ামি লীগের নেতৃত্বে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সোভিয়েতপন্থী রাষ্ট্রের জন্মকে অনিবার্য করে তোলে।

ইতিহাসের প্রকাশ্য দলীল থেকে বাহ্যত যতটুকু জানা যায় - ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিকতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম গোপনে কার্যক্রম শুরু করে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অপকর্ম ও চক্রান্তসমূহ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে কেবল।

(৩)

১৯৬১ সালের শেষদিকে 'পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট' নামে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার আহ্বান সম্বলিত একটি লিফলেট বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ছাপানো হয়। শেখ মুজিবের আস্থাভাজন শিষ্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের ভাষ্যনুযায়ী, শেখ মুজিব নিজে সাইকেল চালিয়ে প্রেস থেকে লিফলেটের অনেকগুলো কপি ছাপিয়ে আনে। এবং নিজ অনুসারী ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তা গভীর রাতে বিলি করায়।

প্রায় একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাথেও শেখ মুজিব গোপনে বৈঠক করে। কিন্তু তারা জানায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে স্বাধীন পূর্ব

পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে, কিন্তু সে দাবী নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পরিস্থিতি নেই। সময় আসলে পাশে থাকার আহবান রেখে শেখ মুজিব বৈঠক শেষ করে।

২-৩ মাস পরই, ১৯৬২ এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত, পাকিস্তান সরকারের 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন' রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সারা দেশ তীব্র আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তানী প্রশাসন পিছু হটে।

আন্দোলনের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে ক্ষমতালোভী, ভারতপ্রেমী শেখ মুজিব আরও আশাবাদী হয়ে উঠে। ঐ বছরেই অর্থাৎ, ১৯৬২ এর ডিসেম্বরে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় তৎকালীন উপহাইকমিশনের (বর্তমানে যা ভারতীয় হাইকমিশন) পলিটিকাল অফিসার শেখর ব্যানার্জিকে মাঝরাতে ডেকে এনে গোপন বৈঠকে বসে শেখ মুজিব। শশাঙ্ক ব্যানার্জিকে শেখ মুজিব জানায়, এই বৈঠক ডাকার উদ্দেশ্য হলো, ব্যানার্জির মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি গোপন চিঠি পাঠানো। চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে সম্বোধন করা হয়।

তাতে ভূমিকার পর সরাসরি একটা কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মুজিব বলছিল, তিনি বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করবেন। মানিক মিয়া দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মাধ্যমে এর প্রচারকার্য চালাবেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চের মধ্যে মুজিব লন্ডনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রবাসী সরকার গঠন করবে। চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফে নৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন এবং সাজসরঞ্জাম চেয়ে নেহরুকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মুজিব গোপনে নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

চিঠিটি এমন সময়ে পাঠানো হলো যখন ভারত মাত্র চীনের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। চীনের সাথে যুদ্ধের পর নেহেরু আরেকটি ফ্রন্ট খুলতে চায়নি। দিল্লী থেকে খবর পাঠানো হয় মুজিব যেন আরও অপেক্ষা করে। কিন্তু মুজিব ভারতীয় মদদের আকাঙ্ক্ষায় ধৈর্য হারিয়ে ভিন্ন পথে এগোলেন। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় পৌঁছে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচিন্দ্রলাল সিংহের সাথে দেখা করে বৈঠক করেন।

শচীন্দ্র মুজিবকে আগরতলায় রেখে দিল্লী গিয়ে নেহরুর সাথে কথা বলে আসে। শচীন্দ্রলাল আগরতলায় ফিরে মুজিবকে জানান, প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছেন, তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ভারতের ঢাকা উপ হাইকমিশনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। নেহরুর পরামর্শ ছিল, এরপর থেকে মুজিব যেন ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেই যোগাযোগ করে, আগরতলার মাধ্যমে নয়।

ভারতের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া সত্ত্বেও, সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করতে আগ্রহী কিছু সামরিক সদস্যবিশিষ্ট একটি গ্রুপকে সহায়তা প্রদানের মানসিকতা থেকে শেখ মুজিব সরে আসেন। কেননা তখন ভারত সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়াও ছিল কিছু আন্তর্জাতিক আইনের মারপ্যাঁচ। আদতে ভারতকে বাদ দিয়ে শেখ মুজিবের স্বতন্ত্র কোনো চিন্তা ছিলই না।

নেহরুর অপেক্ষা করার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে শেখ মুজিব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গ্রুপটির নেতা, পাকিস্তানী নেভির বাঙালি অফিসার লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে জানিয়ে দেন, "আমি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঙালি সামরিক জান্তার হাতে তুলে দিতে পারিনা।"

শেখ মুজিবের এমন্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ হয় বাঙালি স্বার্থ নয়, বরং ভারতীয় স্বার্থরক্ষাই ছিল তার প্রধানতম লক্ষ্য। যদিও, পরবর্তীতে শেখ মুজিবের আগরতলা সফরের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং জেনারেল আইউব খান তাকে আটক করে।

রাজনৈতিক মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে শেখ মুজিব আগরতলা মামলা চলাকালে নিজেকে নির্দোষ দাবী করলেও, সম্প্রতি বাংলাদেশের ডেপুটি স্পিকার ও আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী কর্নেল (অব.) শওকত আলী প্রকাশ্যে সংসদে বলে বসেন,

> "আগরতলা মামলা ষড়যন্ত্র ছিল না, এটা ছিল সত্য। মামলাটি ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য। এই অন্যান্যদের মধ্যে আমরা ৩৪ জন ছিলাম। ১৯৬৮ সালের ১৯ শে জুন আমাদের ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হয়। সে সময় পাকিস্তানের ওই বিশেষ আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগে বলা হয়,

আপনারা পাকিস্তানের পূর্বভাগ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথক করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই অভিযোগটি সত্য ছিল।"

শেখ মুজিব এরপর থেকেই ভারতীয় সরকারের সাথে নিয়মিত পরামর্শের ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে সঠিক সময় আসার পূর্বে, পৃথক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে শেখ মুজিব অগ্রসর হয়। এ উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা প্রচার প্রসার চলমান ছিল আসন্ন ষড়যন্ত্রকে সামনে রেখে।

এর পাশাপাশি সভাপতি হওয়ার সাথে সাথেই দলের নাম 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'আওয়ামী লীগ' করে পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজবপনে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয় শেখ মুজিব। অথচ, দলের প্রতিষ্ঠালগ্নে অলি আহাদের আপত্তি সত্ত্বেও, পাকিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধোঁকা দিতে শেখ মুজিব স্বয়ং দলের নামের মধ্যে মুসলিম শব্দের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেছিল!

(৪)

পূর্ব পাকিস্তানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে; অন্ততপক্ষে এর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা ভারতের পরিকল্পনা ছিল। যার ফলাফল প্রকাশিত হয় শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবীর মাধ্যমে। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা রাখে এটি। দল মত নির্বিশেষে এমনকি কমিউনিস্টরাও এখানে ভারতীয় চক্রান্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

কেননা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রদেশে আপাতত রূপান্তরিত করলেও, এক সময় তা ভারতের অঘোষিত অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে তা ছিল নিশ্চিত। বাহ্যত শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার জনসাধারণের জনমত নিজ পক্ষে আনতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুললেও, এধারার আড়ালে তার আরেকটা প্রক্রিয়া চালু ছিল। মূলত, এই প্রক্রিয়াটিই ছিল শেখ মুজিবের শক্তির মূল উৎস। আর তা হচ্ছে হিন্দুদের সাথে মিলে গিয়ে হিন্দুদের প্রাধান্য নিশ্চিত করে ভারতীয় সরকারের নৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক সহায়তা লাভ।

শেখ মুজিবের ইন্ডিয়া কানেকশন নিশ্চিত করতে মৌলিক ভূমিকা রাখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক, ভারতীয় কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা RAW এর এজেন্টরা। ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন সুতার শেখ মুজিবের সাথে 'র' ও ইন্দিরা গান্ধীর গোপন আলোচনা সলাপরামর্শ ও যোগাযোগের বিষয়টি সমন্বয় করতেন।

কালিদাসের ভাষ্যে শেখ মুজিবের এই হিন্দুত্ববাদী পরিকল্পনার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে,

> "শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার বা চিত্তবাবুর কথাবার্তা হতো অত্যন্ত গোপনে। কারণ, আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিপজ্জনক। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও চিত্তবাবু ও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাক্তার হওয়ার সুবাদে তাঁর বাড়ি যাওয়ার আমার অবাধ সুযোগ ছিল।
>
> ...চিত্তবাবু (চিত্তরঞ্জন সুতার) ও আমার মধ্যে এই বোঝাপড়া হয়েছিল যে ঘটনা এমনভাবে ঘটিয়ে যেতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষই চিৎকার করে বলতে থাকবে, আমরা পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চাই।
>
> স্বায়ত্তশাসনের দাবির আড়ালে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তখন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তখন তাদের কাছে স্বাধীনতা ছিল কল্পনাতীত। শুধু তা-ই নয়, স্বাধীনতার কথা বললে তখন সব রাজনৈতিক দলই তার বিরোধিতা করত।...
>
> ...পাকিস্তান সৃষ্টির ২২ বছর পরও যদি সংখ্যালঘুদের ভিটামাটি ছাড়িয়া যাইতে বলা হয় তবে নূন্যতম দায়িত্ব হিসাবে তাহাদের জন্য অন্য কোন আস্তানার ব্যবস্থা করিয়াই তাহাদের যাইতে বলিতে হইবে - এই বক্তব্য সংখ্যালঘুদের জন্য পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে একটি হোমল্যান্ড গড়ার দাবির ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ইসলামিক পাকিস্তানের মধ্যে বসবাস করে এর থেকে স্পষ্ট ভাষায় এই দাবির কথা বলা সম্ভব ছিল না। ..

আমরা বুঝতে পারি মুজিবের মনে যা-ই থাকুক না কেন, বৃহত্তর স্বার্থে তার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ... মুজিবেরও তখন প্রয়োজন ছিল সব সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার। তাই পারস্পরিক স্বার্থেই ক্রমে যোগাযোগ ঘনীভূত হয়।..."

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েই ভারতের আহবানে শেখ মুজিব লন্ডনে সফর করে। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটার পর শেখ মুজিব উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ এর সেপ্টেম্বরের সেই লন্ডন সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ প্রতিনিধি 'RAW' এর পাকিস্তান ডেস্কের প্রধান ফনিন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে বৈঠক করে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শেখ মুজিব। ঐ বৈঠকেও ভারতের পক্ষ থেকে ট্রেনিং ও অস্ত্র সহযোগিতার আশ্বাস পায় শেখ মুজিব। ভারতীয় সরকারের সাথে নিয়মিত গোপন সলাপরামর্শ, যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে শেখ মুজিব ভারতের কলকাতায় স্থায়ীভাবে প্রেরণ করে কট্টর হিন্দুবাদী নেতা, 'র' এর কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের নেতা চিত্তরঞ্জন সুতারকে! সুতার ১৯৭১ সালে ভবানীপুরের ২৬ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ সড়কের ১৮ কক্ষের সানি ভিলায় বাস করতো। ভারতীয় পাসপোর্টে সুতারের নাম ছিল ভুজঙ্গ ভূষণ রায়।

পরবর্তীতে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চে শেখ মুজিব গ্রেফতারের পর যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে, ভারতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মুজিববাহিনীর চার নেতার পরিকল্পনাকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থলও হয় শেখ মুজিবের প্রতিনিধি চিত্ত সুতারের এই বাড়িটি। এরপরের ৯ মাসের ঘটনা মোটামুটি আমাদের সকলেরই জানা। ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, পূর্ব বাংলার মুসলিমরা অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানী শাসকদের জুলুম থেকে ভারতীয়দের লুণ্ঠনের মাঝে এসে পরে, যা আজও চলমান।

(৫)

মূলতঃ ১৯৬৯ এর পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের ছত্রছায়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-আমলাদের অনীহা ও বিমাতাসুলভ আচরণের ফলাফল হিসেবে, ১৯৭০ এর নির্বাচনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের আকস্মিক বিজয় হিসাব পাল্টে দেয়। শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানের ভারত-সোভিয়েতপন্থী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মোহে আবদ্ধ হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পাকিস্তানী সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানকে ত্যাগ করে হলেও, পাকিস্তানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সুসংহত করতে, ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি মুসলমানদের পাইকারি হারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঠিক তখনই শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ভারতের পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগামী হলো।

১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ী হওয়া শেখ মুজিবের মনে ভারতবান্ধব পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা অল্প সময়ের জন্য জাগ্রত হয়ে থাকলেও, তার দ্বারা আসলে ঠিক ঐ রাজনৈতিক ফলাফলই ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় যা ভারত চেয়েছিল।

যদিও পশ্চিমা পাকিস্তানী শাসক ও জেনারেলদের নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের দরুন, পূর্ব বাংলার মুসলিমদের এর কোনো বিকল্প ছিল না। ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হওয়া জঘন্য আগ্রাসন এবং বিশেষ করে পাইকারী হত্যা ও ধর্ষণের মতো অপরাধের মাধ্যমে পাকিস্তানী তাগুত শাসকগোষ্ঠী জেনারেলরাই পূর্ব বাংলার মুসলিমের জন্য যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

পাকিস্তানী জেনারেল ও শাসকদের জুলুম, অন্যায়-অনাচার ও প্রতারণার সুযোগ ক্ষমতা-লিপ্সু, সেক্যুলার শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অপতৎপরতার পরিপূর্ণ ফায়দা ঘরে তোলে উপমহাদেশে ইসলামের কঠিনতম শত্রু ভারতীয় সরকার। ভারতের পক্ষে সম্ভব হয় পাকিস্তানের সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে হিন্দুদের অধীনস্ততা মেনে নেয়া একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দান করা। যে রাষ্ট্রের পানি, ফসল ও সম্পদের পূর্ণ হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়েও কঠিনভাবে আদায় করে নিচ্ছে আজও ভারতের হিন্দু শাসকরা।

(৬)

এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মোহ খুব দ্রুতই কেটে যায়। তাদের সামনে ভারতীয় ডিকটেশনের নগ্নরূপ উন্মোচিত হতে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে শুরু থেকেই শেখ মুজিব ভারতীয় দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং পুনঃপুনঃ আন্দোলনের মুখে তার প্রশাসনিক কার্যক্রম বারবার বাঁধার সম্মুখীন হয়।

এক পর্যায়ে মাত্র সাড়ে ৩ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, শেখ মুজিব কুকুরের মতো নিহত হলেও; এদেশের একটি কাকও তার জন্য কাঁদেনি। কেননা, পাকিস্তানী প্রশাসনের জুলুম যে জাতি মেনে নেয়নি, সে জাতি হিন্দুদের কর্তৃত্বে বসবাস করা সহ্য করবে এমনটা কষ্টকল্পিতই ছিল।

আশা করা যায়, শেখ মুজিবের প্রেতাত্মাস্বরূপ বাংলার মুসলমানদের উপর জুলুমের রাজত্ব কায়েমকারী, বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসক শেখ হাসিনার পতনও আসন্ন। শুধু প্রয়োজন কিছু সচেতন পদক্ষেপের!

আর আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন।

****